রবীন্দ্রনাথের অর্থনীতি-চিন্তা

সেলিম জাহান*

সূচনা

বাঙলা ও বাঙালীর জীবনে যে মানুষ এককভাবে সবচেয়ে বেশী প্রভাব ফেলেছেন, তিনি রবীন্দ্রনাথ। আমাদের জীবনে ও সমাজের এমন কোন দিক নেই যা তাঁর চিন্তা-চেতনা, রচনা বা বক্তৃতায় স্থান পায়নি। এক কথায় বলা চলে, বাঙলা ও বাঙালীর জীবনে রবীন্দ্রনাথ প্রভাব সর্বগ্রাসী। তবে এ প্রভাব শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথের সর্বতোমুখী প্রতিভার কারণেই শুধু নয়, এর অন্যতম কারণ এ দেশ, মাটি, সমাজ, মানুষ ও জীবনের প্রতি তাঁর অসীম অনুরাগ ও মমত্ববোধ।

বাঙলার সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা, জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রচুর প্রত্যক্ষ রচনা আছে, যা প্রমাণ করে যে তিনি শুধুমাত্র শুদ্ধ নন্দনতাত্ত্বিক কবি ছিলেন না, তিনি ছিলেন সমাজ-চেতন, শিক্ষিত, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন একজন আধুনিক মানুষ। সেই সঙ্গে সঙ্গে এ সব রচনা এ সব বিষয়ে তাঁর গভীর ও স্বচ্ছ চিন্তারও পরিচয় বহন করে। এ সব বিষয়ে তাঁর গভীর ও স্বচ্ছ চিন্তারও পরিচয় বহন করে। এ সব বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-চেতনার সঙ্গে আমরা পরিচিত হয়েছি বিভিন্ন রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞের রচনার কল্যাণে।

সমাজ-জীবনের যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথকে অপেক্ষাকৃত নীরব বলে আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয়, সেটি হচ্ছে অর্থনীতি। এ মনে হওয়ার পেছনে দু'টো কারণ অত্যন্ত জোরালো—প্রথমতঃ সমাজ, শিক্ষা, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের যে রকমের একাধিক জনপ্রিয় প্রত্যক্ষ রচনা রয়েছে, অর্থনীতি বিষয়ে শ্রীনিকেতন বা পল্লী-সমাজ বিষয় ব্যতীত রবীন্দ্রনাথের সে অর্থে তেমন বহুল প্রচারিত কোন প্রত্যক্ষ রচনা নেই এবং দ্বিতীয়তঃ অর্থনীতি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের

* অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

চিন্তা-চেতনার সঙ্গে আমাদের পরিচিত করার ব্যাপারে, অন্ততঃ আমার জানা মতে, এ পর্যন্ত রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞদের মধ্যে তেমন কোন প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় না। ফলে অর্থনীতিবিদ রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে তুলনামূলকভাবে অপরিচিত থেকে গেছেন। কিন্তু অর্থনীতি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ শুধুমাত্র তাঁর পুত্র রবীন্দ্রনাথকে কৃষি বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষার জন্য আমেরিকায় প্রেরণে কিংবা শান্তিনিকেতন স্থাপনের পেছনে তাঁর একটি অর্থনৈতিক চিন্তার অবস্থিতিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, অর্থনীতি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের যে একটি অত্যন্ত গভীর, সুবিন্যস্ত ও আধুনিক ধ্যান-ধারণা ছিল, তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনায় বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে আছে। সে সব ধ্যান-ধারণাকে সুগ্রথিত করলে পরে অর্থনীতিবিদ রবীন্দ্রনাথও তাঁর অন্য পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চোখে অনেক বড় হয়ে ওঠেন।

বর্তমান প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের অর্থনীতি-চিন্তাকে একটি সুবিন্যস্ত আঙ্গিকে উপস্থাপিত করা এবং সে সব ধ্যান-ধারণার একটি বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করা। এ আলোচনাকে একটি সংহত রূপ দেয়ার জন্য প্রবন্ধটিকে দু'টো ভাগে বিভক্ত করা হচ্ছে। প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে রবীন্দ্রনাথের অর্থনীতি-চিন্তার পটভূমি ও সে চিন্তার মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো সংক্ষেপে আলোচিত হবে। সুতরাং প্রবন্ধের এ অংশের কাজ হবে আমাদের মূল আলোচনার একটি প্রেক্ষিত গড়ে তোলা। প্রবন্ধের অনুগামী অংশে রবীন্দ্রনাথের অর্থনীতি-চিন্তার বিস্তৃত রূপ উপস্থাপিত ও বিশ্লেষিত হবে। সে বিশ্লেষণে অর্থনীতির বিভিন্ন দিকে রবীন্দ্রনাথের ধ্যান-ধারণা আলোচিত হবে। প্রয়োজন বোধে সে আলোচনার স্বপক্ষে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনা ও বক্তৃতার অংশ উদ্ধৃত হবে। কিছু উপসংহারমূলক মন্তব্যের মাধ্যমে প্রবন্ধটি শেষ করা হবে।

রবীন্দ্রনাথের অর্থনীতি-চিন্তা ঃ পটভূমি ও মৌলিক বৈশিষ্ট্য

একটা কথা প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সাধারণত আমরা রবীন্দ্রনাথকে সাহিত্যিক ও দার্শনিক হিসেবেই ভাবতে অভ্যস্ত, কিন্তু অর্থনীতি বিষয়ে তাঁর কোন কোন বক্তব্য যখন আমরা পড়ি, তখন তাঁকে একজন প্রথম শ্রেণীর পেশাগত অর্থনীতিবিদ বলে মনে হয়। তাঁর পড়াশোনার ব্যাপ্তি, ধ্যান-ধারণার মৌলিকত্ব ও চিন্তার গভীরতাই এর অন্যতম কারণ বলে মনে হয়। অর্থনীতি বিষয়ে একজন উচ্চ শ্রেণীর অর্থনীতিবিদের মত রবীন্দ্রনাথের কিছু বক্তব্যের দৃষ্টান্ত

তুলে ধরা যেতে পারে ঃ

এক, 'খরিদ্দারের তরফে যেখানে অধিক মূল্য হাঁকে, ব্যবসাদারের তরফ হইতে সেইখানেই অধিক মাল আসিয়া পড়ে'। নব্য প্রত্ন অর্থনীতির বাজার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আমরা বর্তমানকালে সে মৌলিক সমালোচনা করে থাকি, তারই সারমর্ম অত্যন্ত সহজভাষায় রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে প্রতিফলিত হয়েছে। আমরা বলে থাকি যে নব্য প্রত্ন অর্থনীতিতে আমরা যখন বাজার শক্তির মাধ্যমে পণ্যের উৎপাদন, মূল্য নির্ধারণ ও তার বন্টনের কথা বলি, তখন সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আয় ও সম্পদের বন্টনকে দেয় সত্য বলে ধরে নেই এবং তার পুনর্বন্টন সম্পর্কে কোন কথা বলি না। সুতরাং এ জাতীয় একটি কাঠামোতে সামাজিকভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের প্রয়োজনের পণ্য উৎপাদিত হয় কম, পুরো উৎপাদন ব্যবস্থা ঝুঁকে পড়ে সে সব পণ্যের চাহিদা মেটাতে, যার চাহিদা সমাজের সম্পদশালী ও উচ্চবিত্তের মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তাই দরিদ্রতম দেশেও রঙ্গীন টেলিভিশন ও গাড়ী উৎপাদিত ও বিক্রি হয়ে থাকে। বাজার ব্যবস্থা যদি কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চালিক-শক্তি হয় এবং সে ব্যবস্থায় যদি আয় ও সম্পদের বৈষম্য বিদ্যমান থাকে তবে উৎপাদন ব্যবস্থা সামাজিক প্রয়োজন না মিটিয়ে গোষ্ঠীর প্রয়োজন মেটাবে—এ অর্থনৈতিক তত্ত্বটিই রবীন্দ্রনাথের উক্তির মূল কথা। এ তত্ত্বটিকেই অন্য প্রেক্ষিতে তিনি অন্যভাবে বলেছেন, 'জমি যদি খোলা বাজারে বিক্রি হয়ই, তা'হলে যে ব্যক্তি স্বয়ং চাষ করে, তার কেনবার সম্ভাবনা অল্পই; যে লোক চাষ করে না কিন্তু যার আছে টাকা, অধিকাংশ বিক্রয়যোগ্য জমি তার হাতে পড়বেই'।[২]

দুই, 'ধনের ব্যক্তিগত বিভাগ থাকলেই ধনের লোভ আপনিই হয়'।[৩] পুঁজিবাদ সম্পর্কে যে মৌলিক সমালোচনা উচ্চারিত হয়, রবীন্দ্রনাথের উক্তি তার সারাংশটিকেই প্রকাশ করছে। উৎপাদন উপকরণ ও সম্পদের ওপর ব্যক্তি মালিকানা থাকলে সেখানে ব্যক্তিগত আয় ও মুনাফা বাড়ানোর ইচ্ছা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই আসবে—এটাই অর্থনৈতিক তত্ত্ব। উৎপাদন উপকরণ ও সম্পদের মালিকানা সামাজিকীকরণের মাধ্যমেই কেবল যৌথভাবে সবার মঙ্গল নিশ্চিত করা যায়।

তিন, 'সঞ্চয়ের নেশা বড় দুর্জয় নেশা। একবার যদি হাতে কিছু জমিয়া যায়, তবে জমাইবার ঝোঁক আর সামলানো যায় না'।[৪] বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের 'জমাইবার ঝোঁক'ই অর্থনীতি শাস্ত্রের 'সঞ্চয় প্রবণতা' এবং অর্থনীতিবিদেরা সঞ্চয় প্রবণতা সম্পর্কে মানব-আচরণের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা তারই সহজ সরল

রূপ। নব্য প্রত্ন অর্থনীতিবিদেরা বলছেন যে উচ্চ আয়ের লোকদের কাছে বাড়তি আয় আরও কেন্দ্রীভূত হলে সঞ্চয় বেশী হবে, কারণ তাদের সঞ্চয় প্রবণতা বেশী। এ প্রবণতা বেশী হওয়ার কারণ পূর্ববর্তী সময়কালসমূহে তাদের ভোগ চাহিদা তারা প্রায় সবটুকুই মিটিয়ে ফেলেছে এবং ফলশ্রুতিতে ক্রমাগত সঞ্চয় বাড়াতে বাড়াতে তাদের সঞ্চয় প্রবণতা বাড়তে বাধ্য।

চার, 'বাণিজ্যে বসতঃ লক্ষী।'[৫] এর সঙ্গে অপূর্ব মিল রয়েছে নব্য প্রত্ন অর্থনীতির সে বিখ্যাত উক্তির, 'বাণিজ্য প্রবৃদ্ধির চালিকা শক্তি'।[৬] প্রত্ন ও নব্য প্রত্ন অর্থনীতিতে বলা হয়েছে যে কোন দেশের প্রবৃদ্ধি শুধুমাত্র দীর্ঘসময়ে শুধুমাত্র সে দেশের বাজারের ওপর নির্ভর করে হতে পারে না, কারণ সব দেশেরই আভ্যন্তরীণ বাজার একটি নির্দিষ্ট সময় পরে হয় সীমাবদ্ধ নয় পরিপূর্ণ হয়ে আসবে। সে অবস্থায় যদি ঐ অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির হারকে বজায় রাখতে হয়, তা'হলে বৈদেশিক বাজার খুঁজতে হবে এবং বাণিজ্যের মাধ্যমে সে বাজারকে অধিকার করতে হবে। অর্থনৈতিক তত্ত্বের সরাসরি প্রতিফলন রয়েছে রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত বক্তব্যে।

পাঁচ, 'আধুনিক রাষ্ট্রনীতির প্রেরণাশক্তি বীর্যাভিমান নয়, সে হচ্ছে ধনের লোভ।'[৭] নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথের এ কথাটির মধ্যে কিছুটা সরলীকরণ রয়েছে, কারণ রাষ্ট্রের বীর্যাভিমান বস্তুটি আজকের পৃথিবীতে অনেকটাই সম্পদ-নির্ভর, তবু রাজনৈতিক অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে এ তত্ত্বের সত্যতা কেমন করে অস্বীকার করা যাবে? রাজনৈতিক অর্থনীতির একটি অন্যতম ধ্রুপদী গ্রন্থের নাম 'জাতিসমূহের সম্পদ,- যার মুখ্য উদ্দেশ্য কি করে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহ ধনবান হতে পারে তার পথ নির্দেশ করা।[৮]

এ স্বল্প সংখ্যক দৃষ্টান্ত থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে রবীন্দ্রনাথ অর্থনীতি বিষয়ে কিছু কিছু উক্তি করেছেন যা শুধু অর্থনৈতিক কিছু তত্ত্বের সমার্থক। অর্থনীতিবিদ রবীন্দ্রনাথকে সে সব জায়গায় চিনতে ভুল হয় না ঠিকই, তবে এ সব দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের অর্থনীতি শাস্ত্র সম্পর্কে সচেতনতা এবং সম্ভবতঃ এ শাস্ত্র সম্পর্কে তাঁর পঠন পাঠনই নির্দেশ করে মাত্র; এ গুলো তাঁর অর্থনৈতিক দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করে না। অর্থনৈতিক দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের ধ্যান-ধারণার বিস্তৃত রূপ আমি প্রবন্ধের পরবর্তী অধ্যায়ে উপস্থাপিত করতে প্রয়াসী হব।

তবে এসব ধ্যান-ধারণার পটভূমির দু'টো দিক সম্পর্কে আমাদের সচেতনতা অত্যন্ত প্রয়োজন। প্রথমতঃ রবীন্দ্রনাথের অর্থনৈতিক চিন্তা-

চেতনা তাঁর সমাজ-চেতনার পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত। রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সমাজকে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে চেষ্টা করেছেন—যে সমাজে বস্তুগত সম্পর্ক নয়, মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মার বন্ধন হবে মুখ্য, যে সমাজের মূল কেন্দ্রবিন্দু হবে পল্লী অঞ্চল এবং যে সমাজ ঐতিহাসিকভাবে ভারতবর্ষে যে ভাবে ছিল সে ভাবে বস্তুকেন্দ্রীক না হয়ে আত্মিক কাঠামোর ওপর গড়ে উঠবে। এ জাতীয় সমাজের স্বপ্ন রবীন্দ্রনাথের মনে ছিল এবং শান্তিনিকেতন গড়ার পেছনে এ জাতীয় চিন্তা-চেতনা তাঁর মনে কাজ করেছে। রবীন্দ্রনাথের অর্থনীতি বিষয়ক ধ্যান-ধারণা এ কাঙ্খিত সমাজকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। দ্বিতীয়তঃ রবীন্দ্রনাথ প্রচন্ড রকমভাবে মানবতাবাদী ছিলেন এবং মানুষের আত্মার উৎকর্ষতাই ছিল তাঁর কাছে মানব জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তা-চেতনায় রবীন্দ্রনাথ বস্তুগত বিষয়-গুলোকে উপেক্ষা করেন নি ঠিকই, কিন্তু বারবারই তিনি মানুষের মনুষ্যত্ব ও আত্মিক দিককে টেনে এনেছেন। এর ফলশ্রুতিতে রবীন্দ্র-নাথের অর্থনৈতিক মানুষ শুধুমাত্র বস্তুতান্ত্রিক মানুষ নয়। সে মানববাদী ও আত্মিক উৎকর্ষতায় নিমগ্ন এবং রবীন্দ্রনাথের অর্থনীতি শুধুমাত্র বস্তুগত কোন প্রায়োগিক ব্যাপার নয়, এটি একটি নীতি শাস্ত্রও বটে। এর ফলে রবীন্দ্রনাথ অর্থনীতি শাস্ত্রকে একটি সীমাবদ্ধ সংজ্ঞার গন্ডি থেকে মুক্তি দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু এর ফলে কোথাও কোথাও তিনি একে স্বপ্নিল করেছেন, বাস্তব-বর্জিত করেছেন এবং অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বেরও সৃষ্টি করেছেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের মত মানব-তাবাদী ও মানবাত্মায় বিশ্বাসী দার্শনিকের পক্ষে এ ভিন্ন অন্য কোন পথ ছিল বলেও আমার মনে হয় না।

তবে একজন সমাজ সচেতন মানুষ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ অর্থ-নীতিকে সমাজের অন্যান্য দিক বিচ্ছিন্ন একটি শুদ্ধ শাস্ত্র হিসেবে দেখেন নি। এর পরিপ্রেক্ষিতে যখনই তিনি অর্থনীতি বিষয়ে আলোচনা করেছেন, তখনই তিনি শিক্ষা, ধর্ম, রাজনীতি ও জাতীয়তাবাদ বিষয়গুলোর পরিপ্রেক্ষিতেই সে আলোচনা করেছেন। সুতরাং অর্থ-নীতির সঙ্গে সমাজ প্রেক্ষিতের এ সব অন্যান্য দিকগুলোর যে পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে, সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সচেতন ছিলেন এবং অর্থনীতির সঙ্গে এদের মিথষ্ক্রিয়ার ব্যাপারটিও তাঁর আলোচনায় এসেছে।

এখানে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। এ দেশের সমাজ, তার স্বরূপ ও প্রকৃতি, তার গতিময়তা এ সব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটে যখন জমিদারীর কাজ উপলক্ষে তিনি পূর্ববঙ্গের

শিলাইদহ ও শাহজাদপুরে এসেছিলেন এবং বেশ কিছুদিন সেখানে অবস্থান করেছিলেন। বস্তুতঃ এ দেশের পল্লীসমাজ, এ দেশের কৃষি-ব্যবস্থা, এ দেশের গ্রামীণ দারিদ্র্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় তাঁর পূর্ববঙ্গে অবস্থান কালেই। অতএব তাঁর সমাজ সচেতনতা, তাঁর অর্থনৈতিক ধ্যান-ধারণা এবং তাঁর সার্বিক চিন্তাধারার গঠন, পরিবর্তন এবং পরিপক্কনের ক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গের জীবন একটি অনন্য-সাধারণ ভূমিকা পালন করেছে বলে আমার বিশ্বাস।

রবীন্দ্রনাথের অর্থনীতি-চিন্তা ঃ বিস্তৃত বিশ্লেষণ

ভারতীয় সমাজব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে স্বনির্ভর পল্লী সমাজ ছিল এ ব্যবস্থার প্রাণ কেন্দ্র। এ ব্যবস্থার দুটো মৌলিক বৈশিষ্ট্য ছিল ঃ এক, এ সমাজে প্রতিটি মানুষ একে অন্যের প্রয়োজন মেটাবে এবং দুই, এ সমাজে গ্রামপতি ও গ্রামবাসীদের মধ্যকার সম্পর্কটি হবে রক্ষণ ও আনুগত্যের। এ সমাজ-কাঠামো থেকে কয়েকটি জিনিষ বেরিয়ে আসে—যেমন, এখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবসায়িক বন্ধন থাকবে নিঃসন্দেহে, কিন্তু সে বন্ধনকে ছাপিয়ে মুখ্য হয়ে উঠবে একটি আত্মীয়তার বন্ধন; এখানে শাসক ও শাসিতের মধ্যকার সম্পর্ক শোষণের হবে না, বরং সেখানে শাসক শাসিতের স্বার্থ যথার্থভাবে রক্ষা করবেন এবং শাসিত শাসকের অনুগত থাকবে, এখানে ধনের আধিক্য দ্বারা যেমন নেতৃত্ব লাভ করা যাবে না, তেমনি মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণেও সম্পদের কোন মুখ্য ভূমিকা থাকবে না। ভারতীয় সমাজের এ রূপটিকেই রবীন্দ্রনাথ আদর্শ-স্থানীয় ও কাম্য বলে গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তা-চেতনায় এ জাতীয় একটি সমাজ কাঠামোয় পেঁছিনোর প্রয়োজনীয় কর্মধারা প্রাধান্য পেয়েছিল।

এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রবীন্দ্রনাথের অর্থনৈতিক চিন্তা-চেতনার কয়েকটি দিক বেরিয়ে আসে। তাঁর দৃষ্টিতে, মাতৃভূমির যথার্থ স্বরূপ গ্রামের মধ্যেই এবং পল্লী সমাজের সম্পর্কের মূল ভিত্তি হচ্ছে আত্মীয় ও প্রতিবেশী সম্পর্ক। একে সম্পূর্ণ ধ্বংস হতে দিলে মানবসম্বন্ধের মাধুর্য অন্য কোন আধারে রক্ষা করা যাবে না, এটাই ছিল রবীন্দ্র-নাথের বিশ্বাস। মানুষের সঙ্গে মানুষের কিছু সম্পর্ক থাকে যাকে বলা চলে প্রয়োজনের সম্পর্ক অথবা ব্যবসায়িক সম্পর্ক। সেখানে একজন মানুষ অন্য মানুষের কাছে মূলতঃ একটি 'কার্যসাধনের কল,' আবার অন্য এক সম্বন্ধ আছে যাতে প্রয়োজনও হয়তো মেটে, কিন্তু

প্রয়োজনের বেশী কিছু পাওয়া যায়। মানুষে মানুষে এ দ্বিতীয় সম্বন্ধের ভিত্তিতেই রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সমাজকে চিহ্নিত করেছেন এবং সে সমাজ মুখ্যতঃ পল্লী সমাজ।

এ আত্মীয় বা প্রতিবেশী সমাজে একদিন ছিল যখন গ্রামের সম্পন্ন ব্যক্তিরা, জমিদারশ্রেণী ও গ্রামপতিরা গ্রামত্যাগী হতেন না, পল্লীই তাদের বাসস্থান ছিল। ধনীর ও পল্লীপতির একটা দায়িত্ব সেদিন ধর্মে স্বীকৃত ছিল; সে অনুশাসন সকলে সমানভাবে মানতেন এমন নয়। তবু গ্রামসমাজে যাঁরা বিত্তবান, তাদের বিত্ত নানা প্রকার দানের ভেতর দিয়ে সমাজের সেবায় নিযুক্ত হত। তাঁরাও সমাজের সাধারণ মানুষের কাছ থেকে সম্মান ও আনুগত্য পেতেন তাঁদের কর্মের কারণে, তাঁদের বিত্তের কারণে নয়। দেশের সমাজের অভ্যন্তরেই সে ব্যবস্থা ছিল যার দ্বারা সমাজ নিয়ত রক্ষা পেত ও পুষ্ট হত।

এদেশের সমাজের গতিময়তা সম্পর্কে এটাই ছিল রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস। তিনি আরও বিশ্বাস করতেন যে ভারতীয় ইতিহাসে চিরদিন রাষ্ট্র ও সমাজ দুটো ভিন্নতর সত্ত্বা ছিল, এখানে রাষ্ট্রনীতি ও সমাজনীতির মধ্যে একটা দূরত্ব ছিল, রাষ্ট্র সমাজকে গ্রাস করতে পারে নি। রাজ্য নিয়ে যুদ্ধ চলেছে, এক রাজবংশের পতন ও অন্য বংশের অভ্যুত্থান ঘটেছে, রাজধানীতে পালাবদল দেখা গেছে, দেশী বিদেশী নানা জাতি, নানা শক্তি সেখানে পর্যায়ক্রমে প্রভুত্ব করেছে। কিন্তু এ সবই উপরতলার ইতিহাস, ভারতীয় সমাজ তথা পল্লীসমাজের সংগঠন ও সম্পর্ককে তা কোনভাবেই বদলায়নি।

এ সমাজকাঠামোর সংগঠন ও সম্পর্কের ঐতিহাসিক পরিবর্তনের মাঝেই রবীন্দ্রনাথ এ সমাজের ক্রমাগত অনুন্নয়ন। অবক্ষয়ের কারণ খুঁজেছেন। তিনটে কারণকে এ ক্ষেত্রে মৌলিক বলে তিনি চিহ্নিত করেছেন—যে কারণগুলো বিচ্ছিন্ন নয়, বরং পরস্পরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। এর প্রথম কারণটি হচ্ছে বিদেশী বণিক ও তাদের স্থানীয় সহযোগীদের কর্মকান্ডের মাধ্যমে স্বনির্ভর পল্লীসমাজ বাইরের বিশ্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে এ সমাজে উৎপাদন ব্যবস্থার স্থানীয় প্রয়োজন মেটানোর পরিবর্তে বিশ্ব বাজারের চাহিদা মেটানোর কাজে নিয়োজন, এ স্বনির্ভর সমাজের স্বনির্ভর রূপ হারানো এবং এ সমাজ থেকে সম্পদের স্থানান্তর। দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে বাণিজ্যের মাধ্যমে ধনসম্পদের কেন্দ্রীভূতকরণ ঘটেছে কিছু হাতে। এর দুটো ফলশ্রুতি দেখা যায়, প্রথমতঃ আত্মীয় ও প্রতিবেশী সমাজে ব্যবসায়িক সম্পর্কটি বড় হয়ে উঠেছে এবং দ্বিতীয়তঃ গ্রামপতি ও সাধারণ মানুষের

সম্পর্কের আগের মানবিক ভিত্তি নষ্ট হয়ে তা ধনকেন্দ্রিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজের জন্য সুকর্ম ও গ্রামবাসীদের জন্য মমত্ববোধ এখন আর নেতৃত্বের যোগ্যতার মাপকাঠি থাকে নি, বরং ধনসম্পদের অধিকারত্ব নেতৃত্বের কারণ হয়ে দাঁড়াল। সেই সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্য বৃদ্ধির কারণে রাজ্যপরিচালন কেন্দ্রগুলো নগরকেন্দ্রে পরিণত হল যার ফলশ্রুতিতে রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে বণিকশক্তির একটি যোগাযোগ ঘটল। তৃতীয়তঃ উপরোক্ত দুটো কারণে গ্রামের যাঁরা ধনবান ও বিদ্বান, তাঁরা হলেন নগরবাসী, গ্রামের উদ্বৃত্ত ধন আর গ্রামে নিযুক্ত রইল না, পুঞ্জীভূত হল শহরে রবীন্দ্রনাথের মতে, এইখানেই গ্রাম সমাজের দুর্দশার, অবক্ষয়ের ও অনুন্নয়নের শুরু, এবং তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে এ গ্রামীণ সমাজের অবক্ষয় ও অনুন্নয়নকে রোধ করে আত্মীয় ও প্রতিবেশীসমাজ ভিত্তিক স্বনির্ভর পল্লীসমাজ গড়ে তোলাতেই এ দেশের উন্নতি নিহিত।

এ বিশ্বাসকে সামনে রেখেই তিনি পল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, কর্মক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন পল্লীর প্রাঙ্গনকে এবং স্থাপন করেছিলেন শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের মত প্রতিষ্ঠানকে। জীবনের ঠিক মধ্যবিন্দুতে এসে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আশ্রম ও কর্মক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিলেন শান্তিনিকেতন ও সুরুলের গ্রাম; শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজসংগঠন নিয়ে বীরভূমের ঐ পল্লীপরিবেশে চলল চল্লিশ বৎসরব্যাপী তাঁর অক্লান্ত সাধনা। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'পল্লীসঞ্জীবনই আমার জীবনের প্রধান কাজ'।[৯] এ সঞ্জীবন কাজটি করতে গিয়ে তিনি একটি দীর্ঘমেয়াদী, স্থায়ী পরিকল্পনার রূপরেখা গভীরভাবে ভেবেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের অর্থনীতি-চিন্তা বিকাশের প্রথম দিকে তিনি মনে করতেন যে স্বনির্ভর গ্রামীণ সমাজ তিনি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে চান, তার রূপরেখা ঐতিহাসিকভাবে যে স্বনির্ভর পল্লী সমাজ এ দেশে ছিল, ঠিক তার মতই হবে—অর্থাৎ এ সমাজ মানুষে মানুষে আত্মীয়তা ও প্রতিবেশী সম্পর্ক ভিত্তিক হবে এবং সেই সঙ্গে এ সমাজের নেতার সঙ্গে অনুগামীদের সম্পর্ক আমাদের পল্লীসমাজের ঐতিহ্যবাহী সম্পদ-নিরপেক্ষ রক্ষণ-আনুগত্যভিত্তিক হবে। প্রথম বৈশিষ্ট্যের প্রতি তিনি চিরকালই অভিন্ন মত পোষণ করতেন—সেটা তাঁর মানবতাবাদী দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে কিংবা মানুষের আত্মিক উৎকর্ষতা সাধনই তাঁর মনুষ্যজীবনের লক্ষ্য এ জাতীয় একটি বিশ্বাসের কারণে হতে পারে। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি সম্পর্কে প্রথমদিকে তাঁর ধারণা ঐতিহ্য-

গত ধারণা থেকে ভিন্ন ছিল না। তিনি নিজে পল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, এমন কথাও বলেছিলেন যে, 'রাজগৌরবের সঙ্গে প্রজাদের একটি মানবিক সম্বন্ধ থাকে,' যদিও সে গৌরবে প্রজাসাধারণের অর্থ-নৈতিক অবস্থার কোন উন্নতি হয় কিনা, সে সম্পর্কে কিছু বলেন নি, প্রমথ চৌধুরীর 'রায়তের কথা' প্রবন্ধের জবাব দিতে গিয়ে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে প্রজার স্বার্থ জমিদারের হাতে অত্যন্ত নিরাপদ, কারণ জমিদার প্রজার স্বার্থ সংরক্ষণে নীতিগতভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ।[১০] কিন্তু খুব অল্পকালের মধ্যেই নেতা ও তার অনুগামীদের সঙ্গে এ জাতীয় একটি সম্পর্ক দেয় পরিবর্তিত অবস্থায় ও সম্ভব—এ জাতীয় বিভ্রান্তিটি তাঁর কেটে যায়। কারণ রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন যে ঐ রকম একটি সম্পর্কের জন্য জমিদার বা গ্রামপতিকে ধার্মিক (যথার্থ অর্থে), নীতিবান, বদান্য—এক কথায় কিছুটা অতিমানব হতে হবে, যেটা খুব সম্ভবতঃ তাঁর নিজের মত জমিদার ছাড়া অন্যান্য সাধারণ জমিদারদের হওয়া অসম্ভব প্রায়। দ্বিতীয়তঃ ক্রমান্বয়ে রবীন্দ্রনাথের এ উপলব্ধি এসেছিল যে পল্লীসমাজে ধনী বা গ্রামপতিদের অবস্থিতি ও তাঁদের দান দাক্ষিণ্যের দ্বারা পল্লীসমাজ একটি আত্ম-তোষণমূলক পর্যায়েই স্থবির হয়ে থাকবে, কিন্তু এ জাতীয় দয়া-দাক্ষিণ্যে গ্রামের দুর্দশাও দূর করা যাবে না, কিংবা পল্লী অঞ্চলে উন্নয়নের গতিময়তা সৃষ্টি করা যাবে না।। বরং এ জাতীয় একটি ব্যবস্থার অবস্থিতির ফলে গ্রামবাসীরা তাদের বাঁচবার উপায় যে তাদেরই হাতে এ কথা বিশ্বাস করার মত শক্তি হারিয়ে ফেলবে এবং তারা কখনোই নিজের সমবেত শক্তির ওপর নির্ভর করবার জন্য প্রস্তুত হবে না।

এর পরিপ্রেক্ষিতে এ দেশের পল্লী সমাজের শ্রীবৃদ্ধির জন্য একটি পথের দিকেই দিক্‌নির্দেশ করেছিলেন—সেটি হচ্ছে সমবায়ের পথ। গ্রামের মানুষের বাঁচবার উপায় যে তাদেরই হাতে, সমবায়নীতির দ্বারা এ সত্যকে সাধারণের মধ্যে প্রচার করা প্রত্যেকের কর্তব্য বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন। প্রকৃত প্রস্তাবে সমবায় শব্দটিকে রবীন্দ্রনাথ একটি বৃহৎ অর্থে গ্রহণ করেছিলেন। পরিহাস করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'কো-অপারেটিভের যোগে অন্য দেশে যখন সমাজের নীচের তলায় একটা সৃষ্টির কাজ চলছে, আমাদের দেশে টিপে টিপে টাকা ধার দেয়ার বেশী কিছু এগোয় না।'[১১] রবীন্দ্রনাথের কাছে সমবায়ের পথ ছিল সত্যের পথ। সে সত্যকে তিনি দু'টো দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন—প্রথমতঃ সমবায়ই মানুষের মধ্যে আত্ম-নির্ভরতা, আত্মবিশ্বাস ও সম্মান-বোধের জন্ম দিতে পারে, যে কোন উন্নয়নের জন্যেই যে সব গুণাবলীর

অবস্থিতি অপরিহার্য শর্ত। আত্মশক্তিতে একবার বিশ্বাস স্থাপন করতে পারলে বিচ্ছিন্নভাবে যারা ক্ষুদ্র ও দুর্বল তারাও নিজ নিজ শক্তিকে সমবেত করে এগিয়ে যাবার পথ তৈরী করে নেবে। দ্বিতীয়তঃ সমবায়ের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের কাঙ্খিত আত্মীয় বা প্রতিবেশী সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব। একদিকে এর মাধ্যমে যেমন ব্যবসায়িক কর্মকান্ডে যেমন ঃ উৎপাদন প্রক্রিয়া ও ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে একটি সহযোগিতা ও যৌথ প্রয়াস সম্ভব তেমনি অন্যদিকে এর মাধ্যমে মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও বিচ্ছিন্নতা পরিহার করা সম্ভব। কৃষি হোক, স্বাস্থ্য হোক, আনন্দের উপায় হোক, সমস্যা সমাধানের জন্য মনের ভেতর মিলনের একটা ক্ষেত্র সমবায়ের মাধ্যমে করা যায়। সমবায়নীতিকে রবীন্দ্রনাথ মনুষ্যত্বের মূলনীতি হিসেবে দেখেছেন কারণ মানুষ সহযোগিতার জোরেই মানুষ হয়েছে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে, ভাবের ক্ষেত্রে, কর্মের ক্ষেত্রে সমবায় একটি ঐক্যবোধে নিয়ে যায় এবং ঐক্যবোধের দ্বারাই সব রকমের ঐশ্বর্যের সৃষ্টি—এ কথাটা রবীন্দ্রনাথ মানতেন সুতরাং গ্রামীণ দারিদ্র্যের অবসান, গ্রামের মানুষকে স্বাধীনভাবে সমাজ জীবনের দৃঢ়তর ভিত্তির ওপর দাঁড়ানোর ব্যবস্থার মাধ্যমে পল্লীসমাজের উন্নতির একমাত্র উপায় হিসেবে সমবায়কে চিহ্নিত করেছেন।

তবে সমবায়কে রবীন্দ্রনাথ একটি আচার হিসেবে দেখেন নি, দেখেছেন একটি মতবাদ হিসেবে, যার ভেতর থেকে বহু কর্মধারা সৃষ্ট হতে পারে, যার ভেতর কর্মের ও উদ্দেশ্যের প্রকৃতি অনুযায়ী বহু রূপভেদ সম্ভব। সমবায়ের মাধ্যমে একটি স্বনির্ভর, প্রতিবেশী-সমাজভিত্তিক গ্রামীণ সমাজ গড়ে তোলাই রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য ছিল এবং এর জন্যে যে সমবায়ের রূপরেখা তিনি দিয়েছিলেন তার মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল—

ক) দেশের সমস্ত গ্রামকে নিজের সব রকমের প্রয়োজন সাধনক্ষম করে গড়ে তুলতে হবে। কতগুলো পল্লী নিয়ে এক-একটি মন্ডলী গড়ে উঠবে।

খ) প্রত্যেক মন্ডলীর প্রধান গ্রামের সব কাজের ও অভাবমোচনের ব্যবস্থা করে মন্ডলীকে নিজের মধ্যে পর্যাপ্ত করে তুলবেন যাতে মন্ডলীগুলোই স্বায়ত্ত শাসনের স্তম্ভ হিসেবে কাজ করে।

গ) নিজের পাঠশলা, শিল্প শিক্ষালয়, ধর্মগোলা, সমবেত পণ্য-ভান্ডার ও ব্যাঙ্ক স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ প্রত্যেক মন্ডলীকে গ্রহণ করতে হবে। প্রত্যেক মন্ডলীর একটি করে সাধারণ মন্ডল থাকবে যেখানে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'কর্মে

ও আমোদে সকলে একত্র হইবার স্থান পাইবে এবং সেইখানে ভারপ্রাপ্ত প্রধানেরা মিলিয়া সালিসের দ্বারা গ্রামের বিবাদ ও মামলা মিটাইয়া দিবে'।[১২]

ঘ) জোতদার ও রায়তকে জোট বাঁধতে হবে এবং কৃষিক্ষেত্রে এক একটা মন্ডলী বা এক একটা গ্রামের সকলে একত্র হয়ে নিজেদের সব জমি একত্রে মিলিয়ে দিয়ে চাষবাস করতে হবে। এতে আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহার সম্ভব হওয়ায় উৎপাদনশীলতা বাড়বে ও উৎপাদন প্রক্রিয়া ব্যয় লক্ষ হবে।

ঙ) শিল্পক্ষেত্রে ও সমবায় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিল্প স্থাপন, তাতে কাঁচামাল সরবরাহ, উৎপাদন প্রক্রিয়া পরিচালনা, উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ ও লভ্যাংশ বন্টন করতে হবে। পল্লী অঞ্চলে সে সব শিল্পই স্থাপন করতে হবে যা পল্লীর মানুষের সর্ব অর্থে উন্নতি সাধন করবে।

চ) গ্রামবাসীদের বাসস্থান যাতে পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর হয়, তাদের স্বাস্থ্য যাতে সুরক্ষিত হয়, তাদের জীবন প্রণালী যাতে মানুষের মত হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

এ পুরো পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কয়েকটি প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই এসে যায়—যেমন, এর সাফল্যের পূর্বশর্ত কি, পল্লী সমাজ উন্নয়নে নগর কেন্দ্রের ভূমিকা কি হবে, বহিঃবিশ্বের সঙ্গে সম্পৃক্তকরণ কি জাতীয় হবে, বৃহৎ শিল্প ও প্রযুক্তির সঙ্গে ক্ষুদ্র শিল্পের সহাবস্থানের রূপ-রেখা কি হবে ইত্যাদি। অত্যন্ত আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে রবীন্দ্রনাথ তার গ্রাম উন্নয়নের পরিকল্পনার পাশাপাশি এ সব প্রশ্নের অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত ও সঙ্গতিপূর্ণ উত্তর দিয়ে গেছেন, যে উত্তরগুলো তাঁর পরিকল্পনার সম্পূর্ণ সম্পূরক বলে বিবেচিত হতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনার সাফল্যের কয়েকটি পূর্বশর্ত তিনি চিহ্নিত করে গেছেন। যেমনঃ প্রথমতঃ তাঁরমতে এর জন্যে প্রয়োজন হবে 'বুদ্ধির সাহস ও জনসাধারণের প্রতি দরদবোধ,' সেই সঙ্গে প্রয়োজন হবে ব্যবহারিক জ্ঞান—শুধু পুঁথিগত বিদ্যে নয়, চিন্তার বিস্তার ও সাধারণ মানুষের মানসিকতা বোঝার ক্ষমতা, এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আমাদের কলেজে যারা ইকনমিক্স-এথ্নোলজি পড়ে তারা অপেক্ষা করে থাকে য়ুরোপীয় পন্ডিতের—পাশের গ্রামের লোকের আচার বিচার বিধিব্যবস্থা জানার জন্যে'।[১৪] তিনি আরও বলেছেন, 'আমাদের দেশে আমরা পরবাসী, অর্থাৎ আমাদের জাতের অধিকাংশের দেশ নয়। সে দেশ আমাদের অদৃশ্য, অস্পৃশ্য।'[১৫] দ্বিতীয়তঃ

এর জন্যে প্রয়োজন হবে নিজস্ব চেষ্টার ওপর নির্ভরতা ও সব রকমের পরনির্ভরতা কমানো। রবীন্দ্রনাথের মতে, এর জন্যে শিক্ষিত সমাজকে যুবসমাজকে গ্রামের ভার গ্রহণ করে তাকে ব্যবস্থাবদ্ধ করতে হবে। এটা করার জন্য একটি কর্মীবাহিনী গড়ে তুলতে হবে এবং তাদের উপযুক্ত শিক্ষার জন্য, তাদের প্রস্তুত করার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রস্তাবও রবীন্দ্রনাথ করেছেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে আমাদের সরকার—নির্ভরতা কমাতে হবে। তাঁর মতে মধ্যবিত্তসহ সাধারণ ভারতবাসী ক্রমেই সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ছে। এতেই আমাদের আত্মনির্ভরতা, আত্মবিশ্বাস ও সম্মানবোধ সবই নষ্ট হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, সরকারবাহাদুর নামক একটা অমানবিক প্রভাব ছাড়া আমাদের অভাব-নিবারণের আর কোনো উপায় আমাদের হাতে নেই, এই রকম ধারণা মনে বদ্ধমূল হওয়াতেই আমরা নিজের দেশকে যথার্থভাবে হারাই।'[১৬] এর কারণ রাষ্ট্রপ্রধান দেশে রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যেই বিশেষভাবে বদ্ধ থাকে দেশের মর্মস্থান; সমাজ প্রধান দেশে দেশের প্রাণ সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে থাকে, যার কারণেই রবীন্দ্রনাথ 'রাষ্ট্রতন্ত্র' ও 'সমাজতন্ত্রের' মধ্যে পার্থক্য করেছিলেন। রাষ্ট্র নামীয় একটি হৃদয়হীন যন্ত্রের হাতে সমাজ উন্নয়নকে ছেড়ে দেয়া যায় না। তৃতীয়তঃ এর সাফল্যের জন্য পল্লী সমাজে তিনটি বিষয়ের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে—শিক্ষা, কৃষি ও যন্ত্র। শিক্ষার বিস্তারের মাধ্যমে, কৃষি ক্ষেত্রের উন্নয়নের মাধ্যমে ও উন্নততর প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রাম উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব।

আমাদের দেশে যেভাবে নগর গড়ে উঠেছে, তাতে নগরে যোগ হয়েছে রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে বণিক শক্তির; রাষ্ট্রযন্ত্র ও বণিকতন্ত্রের মধ্যে বাঁধা পড়ে ছিল আমাদের গ্রামগুলো। নগরগুলো আমাদের দেশের শক্তির ক্ষেত্র, কিন্তু গ্রামগুলো প্রাণের ক্ষেত্র—এ বলে রবীন্দ্রনাথ এ সমাজে নগর ও গ্রামের অবস্থানকে নিশ্চিত করেছেন। নগরের সে শক্তির উৎস যন্ত্র, রাষ্ট্রক্ষমতা ও বাণিজ্য। নগর তাই প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র, গ্রামের সহযোগিতাবৃত্তি সেখানে যথোচিত উৎসাহ পায় না, নগর তার শক্তির দাপটে গ্রামকে শোষণ করেছে দীর্ঘকাল ধরে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পল্লীভিত্তিক সমাজ পরিকল্পনায় নগরের একটি স্বাভাবিক স্থান চিহ্নিত করেছেন। সার্বিক সমাজের ভিত্তিতে থাকবে স্বায়ত্তশাসিত গ্রাম, যার আর্থিক উন্নয়নের পথ তৈরী হবে বিজ্ঞান ও সমবায়কে ভিত্তি করে। গ্রামের সঙ্গে যোগ থাকবে শহরের, কিন্তু সে যোগ হবে না আধিপত্য ও অধীনতার, শোষক ও শোষিতের।

সে যোগের ভেতর দিয়ে অবিরত চেষ্টা চলবে এক নতুন সমন্বয়ের। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'নগর আপন নাগরিকতার অভিমান সত্ত্বেও গ্রামগুলোর সঙ্গে জ্ঞাতিত্ব স্বীকার করবে। কতকটা যেন বড়ো ঘরের সদর-অন্দরের মতো। সদরে ঐশ্বর্য্য ও আড়ম্বর বেশি বটে, কিন্তু আরাম ও অবকাশ অন্দরে; উভয়ের মধ্যে হৃদয়সম্বন্ধের পথ খোলা।'[১৭] সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি একথাও বলেছেন যে, 'আমি যখন ইচ্ছা করি যে আমাদের দেশের গ্রামগুলি বেঁচে উঠুক, তখন কখনও ইচ্ছে করি নে যে, গ্রাম্যতা ফিরে আসুক। গ্রাম্যতা হচ্ছে সে রকম সংস্কার... যা গ্রামসীমায় বাইরের সঙ্গে বিযুক্ত'।[১৮] রবীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন স্বনির্ভর পল্লীসমাজের ওপর জোর দিয়েছেন, অন্যদিকে বাইরের জগতের সঙ্গে দেবার ও নেবার পথ উন্মুক্ত রাখবার আকাঙ্খা ছিল তাঁর। সে যোগাযোগের মূল সূত্র রবীন্দ্রনাথের মতে হবে জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং দর্শন। শান্তিনিকেতন স্থাপনের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারত ও বিশ্বের মধ্যে একটা অবারিত আতিথ্যের মিলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা।

প্রথম জীবনে বৃহৎ যন্ত্র, বৃহৎ শিল্প ও আধুনিক প্রযুক্তির বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের একটা বিরূপ মনোভাব ছিল। তাঁর ধারণা ছিল সে বৃহৎ যন্ত্র ও শিল্প এমন এক সমাজ তৈরী করে যেখানে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয় নগরে, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে ও শাসনযন্ত্রে। এতে মানবিক সম্পর্ক গুঁড়িয়ে যায় এবং মানুষ নিজেই হয়ে যায় একটা যন্ত্র বা যন্ত্রের দাস। কিন্তু গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের পরে রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করতে পারলেন সে বৃহৎ শিল্প ও আধুনিক প্রযুক্তিকে বাদ দিয়ে উৎপাদনশীলতা বাড়ানো সম্ভব নয়, উন্নয়ন সম্ভব নয় এবং বৃহৎ শিল্প ও আধুনিক প্রযুক্তি তাঁর স্বনির্ভর পল্লী-সমাজের চিন্তার সঙ্গে দ্বন্দ্বমূলক নয়। তাই গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য যখন তিনি সমবায়ের কথা বলেছেন, তখন সমবায়ভিত্তিক কৃষি ও শিল্পে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কথা তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছেন। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান-শিক্ষা ও ব্যবহারিক জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ ও তিনি করেছেন। বৃহৎ শিল্প ও আধুনিক প্রযুক্তির গুরুত্ব তিনি আরও ভালভাবে উপলব্ধি করেন তাঁর রাশিয়া ভ্রমণের পরে। বাংলাদেশের মন ও অঙ্গ যন্ত্র-ব্যবহারে মূঢ় বলেই আমাদের দুর্দশা—একথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, আমাদের দেশের তাঁতীরা সে উন্নত প্রযুক্তির অভাবে উৎপাদনশীলতা না বাড়াতে পারার কারণে মরেছে সে কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন এবং সে প্রযুক্তি শিক্ষার

জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের মাধ্যমে মন ও মানসিকতা তৈরীর গুরুত্বও স্বীকার করেছেন। তবে প্রযুক্তি বিষয়ে তাঁর শেষ কথা হচ্ছে, 'আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যাকে শুধু তার শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে গ্রহণ করাটা মানুষের কর্তব্য নয়, বরং মনুষ্যত্বের আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যন্ত্র ও প্রযুক্তিকে নতুনভাবে নির্মাণ করাই জরুরী'।[১৯]

রবীন্দ্রনাথের অর্থনৈতিক চিন্তা-চেতনায় মানবতাবোধ ও আত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী বস্তুগত বিষয়কে ছাপিয়ে গেছে বার বার। সাধারণভাবে অর্থ-নীতিতে প্রয়োজনের সম্বন্ধটাই বড় এবং একমাত্র সম্বন্ধ, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাকে হৃদয়ের সম্বন্ধ দ্বারা শোধন করে তবে ব্যবহার করতে বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রজার রাজগৌরবও গ্রহণ যোগ্য, কিন্তু কোন মতেই তার ধনমোহ গ্রহণ যোগ্য নয়। কিন্তু যে কথাটা তিনি ভুলে যাচ্ছেন তা হচ্ছে রাজগৌরবে প্রজার গৌরব করার মধ্যে একটি চিত্তবৃত্তির দিক হয়ত আছে, কিন্তু তার বাইরে প্রজা কিছু পাচ্ছে কি? দ্বিতীয়, যে রাজগৌরবে প্রজা গৌরবান্বিত বোধ করছে, রাজার সে গৌরব কি রাজার ধনমোহ বা সম্পদের কেন্দ্রীভূতকরণ থেকে আসে নি? অর্থ-নীতির বস্তুগত দিককে মানবিক জলে শোধন করার ওপর এত গুরুত্ব দেয়ার ফলে রবীন্দ্রনাথ বহু জায়গায় অসঙ্গতিপূর্ণ বক্তব্যের জন্ম দিয়েছেন। জমিদারের দান-দাক্ষিণ্যকে তিনি প্রশংসা করেছেন, কিন্তু ধনকে নির্মম ও নৈর্ব্যক্তিক বলে তিনি গালাগাল দিয়েছেন, অথচ যে কথাটা তিনি অস্বীকার করেছেন তা হচ্ছে তাঁর প্রশংসিত কাজটির মূলকেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে ঐ নির্মম ও নৈর্ব্যক্তিক ধন। রবীন্দ্রনাথের মতে অর্থ মানবিক দিক নষ্ট করে কিন্তু মানবিক দিকের প্রশংসনীয় ব্যাপারগুলো কি সবসময়ে ধন-বিচ্ছিন্ন? শুদ্ধ বস্তুগত বিষয়কে খর্ব করার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ মানুষের ভোগের একান্ত স্বাতন্ত্র্যকে সীমাবদ্ধ করে দিতে বলেছেন, অথচ সে সঙ্গে তিনি মানুষের ব্যক্তি-গত সম্পত্তির অধিকারকে স্বীকার করেছেন। প্রথম কথাটি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ব্যক্তি স্বার্থপরতা খর্ব করার জন্যে আর দ্বিতীয় কথাটি তিনি উল্লেখ করেছেন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্যে। কিন্তু ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করে ব্যক্তি স্বার্থপরতা খর্ব করা কি সম্ভব? ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করলে তার ব্যক্তিস্বার্থকে কি প্রকারান্তরে স্বীকার করা হয় না? অর্থনীতির বস্তুগত দিকটিকে মানবিকতার প্রলেপ দিতে গেলে বহুক্ষেত্রেই অসঙ্গতি দেখা দেয়, যা রবীন্দ্রনাথের অর্থনৈতিক ধ্যান-ধারণায় সুস্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের ধারণা, বাণিজ্যে মানুষ যে লক্ষ্মীর সন্ধান পেয়েছিল, সেটা শুধু ঐশ্বর্যের কারণে

নয়, তার সৌন্দর্যে—কারণ বাণিজ্যের সঙ্গে তার মনুষ্যত্বের বিচ্ছেদ ঘটেনি। বাণিজ্যে লক্ষীর সন্ধান মানুষ শুদ্ধ বস্তুগত দিক থেকেই পেয়েছিল, সেখানে হৃদয়বৃত্তির কোন কারণ ছিল বলে মনে হয় না। যখন কল বাণিজ্যের বাহণ হল, তখন রবীন্দ্রনাথের মতে বাণিজ্য হল শ্রীহীন। কিন্তু তাতে অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে বাণিজ্যের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয়েছে বলে আমারতো মনে হয় না। 'মুনফা আমরা চাই ভোগের বাহুল্যের জন্য নয়, সাহসের আনন্দের জন্য, একথাটায়ও চিত্তবৃত্তি বড় প্রকট, তবে সেখানে শুদ্ধ অর্থনীতি-চিন্তা কতখানি মুখ্য তা ভাববার বিষয়।[২০] যে কথাটা আমি বলতে চাই তা হচ্ছে অর্থনীতির বস্তুগত বিষয়ের সঙ্গে চিত্ত ও হৃদয়বৃত্তির যোগে হয়ত ঐ শাস্ত্রে নতুন মাত্রিকতা রবীন্দ্রনাথ যোগ করেছেন, তবে তাতে অর্থনীতির বিষয়বস্তুর শুদ্ধতা, বিজ্ঞানমনস্কতা নষ্ট হয়েছে কিনা তা বিশ্লেষিত হওয়া প্রয়োজন। ভোগের বাসনাকে সৌন্দর্যবোধের দ্বারা সংযত করার কথা বলা কিংবা অনাড়ম্বরকে আড়ম্বরের অভাব না বলে পূর্ণতারই একটা ভাব হিসাবে চিহ্নিত করা নন্দনতাত্ত্বিক দর্শনের অংশ হতে পারে, তবে তা অর্থনীতি নয় কোনমতেই। কারণ এটা অর্থনীতি হলে দারিদ্র্যকেও সম্পদের অভাব বলা যাবে না, সেটাও পূর্ণতার একটা ভাব হয়ে দেখা দেবে।

রাশিয়া ভ্রমণ রবীন্দ্রনাথের অর্থনীতি চিন্ত-চেতনায় সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলেছিল বলে আমি মনে করি। এটা যে শুধু একটি ভিন্নতর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটিয়েছিল তাই নয়; বরং অর্থনীতি বিষয়ে তাঁর অনেক নন্দনতাত্ত্বিক ধ্যান-ধারণা এ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা পালটে দেয়। রাশিয়া ভ্রমণের আগে বৈষম্যভিত্তিক একটি সমাজ কাঠামোয় ধনী-দরিদ্রের যে কোন মানবিক সম্পর্ককে তিনি প্রশংসা করেছেন, যে কোন রকমের ধন মোহের তিনি নিন্দা করেছেন এই বলে যে এ মোহ এ ধরণের মানবিক সম্পর্ককে নষ্ট করে দেয়, সে রবীন্দ্রনাথই রাশিয়া ভ্রমণের পরে বলছেন, মানুষের মনে ধনভোগ করার ইচ্ছা আছে, সেই ইচ্ছাকে কৃত্রিম উপায়ে দলন করে মেরে ফেলা যায় না। সেই ইচ্ছাকে বিরাটভাবে সার্থক করার দ্বারাই তাকে তার সংকীর্ণতাকে থেকে মুক্ত করা যেতে পারে।' এখানে অর্থনীতির নগ্ন বস্তুগত দিকটির স্বীকৃতি সুস্পষ্ট, যা এতদিন ধরে রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদী নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির আড়ালে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। তবে এখানে উল্লেখ্য যে, রবীন্দ্রনাথ উপরোল্লেখিত উক্তিটি করেছিলেন সমবায়নীতি প্রসঙ্গে—অর্থাৎ ধনীর নয়, দরিদ্র সমবায়ীর

উন্নত জীবনযাত্রার ইচ্ছাকেই এখানেই সমর্থন করা হয়েছে। রাশিয়ার সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে আন্দোলিত করেছে—তাদের কৃষি ও শিক্ষাব্যবস্থায় তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন।

কিন্তু যে কথাটা এখানে উল্লেখ করা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন তা'হচ্ছে রাশিয়া ভ্রমণ রবীন্দ্রনাথকে সমবায়ী করেছিল কিন্তু সমাজ-তন্ত্রী করতে পারে নি। রাশিয়ার ব্যবস্থা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যদিও এমন সব কথা বলেছেন, 'অন্য দেশে যাদের আমরা জনসাধারণ বলি, এখানে তারাই একমাত্র,' 'অসাম্য চলতে পারে না চিরদিন—কারণ অসাম-ঞ্জস্য বিশ্ব বিধির বিরুদ্ধে,' সেই সঙ্গে এ সব কথাও বলেছেন যে, 'মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সীমা এরা যে ঠিক মতো ধরতে পেরেছে, তা আমার বোধ হয় না। সে হিসাবে এরা ফ্যাসিস্টদের মতো। এই কারণে সমষ্টির খাতিরে ব্যক্তির প্রতি পীড়নে এরা কোন বাধাই মানতে চায় না।'[২২] তবে ফ্যাসিস্টদের সঙ্গে এদের পার্থক্য রবীন্দ্রনাথ চিহ্নিত করেছেন এই বলে যে, মানুষকে এরা দেহের দিকে নিপীড়িত করেছে, মনের দিকে নয়।'[২৩] সুতরাং পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটা মাঝামাঝি ব্যবস্থা রবীন্দ্রনাথ নির্দেশ করেছেন। তাঁর ভাষাতেই, এর একটা মাঝামাঝি সমাধান ছাড়া উপায় আছে বলে মনে করি নে; অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে অথচ তার ভোগের একান্ত স্বাতন্ত্র্যকে সীমাবদ্ধ করে দিতে হবে। সেই সীমার বাইরেকার উদ্বৃত্ত অংশ সর্বসাধারণের জন্যে ছাপিয়ে যাওয়া চাই।'[২৪] অর্থাৎ অর্থনীতির সকল ক্রিয়াকাণ্ডে সমবায় নীতি গ্রহণ।

আসলে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সমাজতন্ত্রী হওয়া সম্ভব নয়। যে মানুষটি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অতবড় ধ্বজাধারী, যিনি সৌন্দর্যতত্ত্বে প্রচণ্ড-রকম অনুরাগী এবং যিনি অর্থনীতির বস্তুগত বিষয়ের চেয়ে এখানে চিত্তবৃত্তিকে প্রাধান্য দেন, তাঁর পক্ষে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ রহিত করে উৎপাদন-উপাদানের পূর্ণ সামাজিকীকরণ, প্রয়োজন বোধে শক্তি প্রয়োগে সমষ্টিগত স্বার্থের কাছে ব্যক্তি স্বার্থের নতিস্বীকার বাধ্য করা এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির অতি প্রকাশ্য বস্তুগত বিষয়গুলোকে কি করে মেনে নেয়া সম্ভব? রবীন্দ্রনাথের মন-মানসিকতার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর পক্ষে খুব বেশী হলে উগ্র মানবতাবাদী (Radical Humanist) হওয়া সম্ভব, কিন্তু প্রকৃত সমাজতন্ত্রী হওয়া সম্ভব নয়। তিনি ঐ পর্যন্তই বলতে পারেন, 'বহুকাল থেকেই আশা করেছিলুম, আমাদের জমিদারি যেন আমাদের প্রজাদেরই জমিদারি হয়, আমরা যেন ট্রস্টির মত থাকি। অল্প কিছু খোরাক-পোশাক দাবি করতে পারব কিন্তু সে

ওদেরই অংশিদারের মতো।[২৫] আমি একে উগ্র মানবতাবোধ সম্পন্ন সমবায়ীর উক্তি বলে বিবেচনা করি, কিন্তু কোন অবস্থাতেই সমাজতন্ত্রীর উক্তি বলে বিবেচনা করি না।

অর্থনীতি-চিন্তায় রবীন্দ্রনাথের মানবতাবোধ ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি তাঁর উপন্যাস ও ছোট গল্পে অত্যন্ত প্রকট। 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে নিখিলেশ যখন তার জমিদারীর হাটে বিলিতি কাপড় বিক্রিতে তার প্রজাদের বাধা দিতে অস্বীকৃতি জানায় তার কারণতো দুটো—প্রথমতঃ এতে দরিদ্র প্রজাদের অসুবিধে হবে এবং দ্বিতীয়তঃ এটা তাদের ব্যক্তিগত অধিকারের ওপরে হস্তক্ষেপ। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে দরিদ্র প্রজার যে দুর্দশা, তা কেলাসিত রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে শাস্তি গল্পে এবং তার ছাপ পড়েছে 'মেঘ ও রৌদ্র', 'উলু খড়ের বিপদ', 'হালদার গোষ্ঠী' প্রভৃতি গল্পে।

রবীন্দ্রনাথ ১৯০০ সালে শ্রীমতী প্রতিমা দেবীকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, 'জীবনের যা লক্ষ্য ছিল শ্রীনিকেতনে শান্তিনিকেতনে তা সম্পূর্ণ সিদ্ধ না হোক, সাধনার পথ অনেকখানি প্রশস্ত করেছি।' জীবনের এ লক্ষ্যের মধ্যে তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তা-চেতনাও প্রাধান্য পেয়েছে এবং একথা দ্বিধাহীণ চিত্তে বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথের অর্থনৈতিক ধ্যান-ধারণার ব্যবহারিক ক্ষেত্র হিসেবেই শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের জন্ম। শান্তিনিকেতনকে যাঁরা শুধু ব্রহ্মচর্য আশ্রম কিংবা বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অথবা জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনস্থল বলে মনে করেন, তাঁরা শান্তিনিকেতনের খন্ডিত চিত্রই পান। আত্মীয়তা বা প্রতিবেশী সমাজ ভিত্তিক যে স্বনির্ভর পল্লী সমাজের স্বপ্ন রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন, শান্তিনিকেতনকে তারই নিরীক্ষাগার বলা চলে। শ্রীনিকেতন সম্পর্কেও সে একই কথা প্রযোজ্য।[২৬]

উপসংহার

রবীন্দ্রনাথের কথা দিয়েই আমি আমার প্রবন্ধের উপসংহার টানতে চাই। 'সমগ্র দেশ নিয়ে চিন্তা করবার দরকার নেই। আমি একলা সমস্ত ভারতবর্ষের দায়িত্ব নিতে পারব না। আমি কেবল জয় করব একটি বা দু'টি গ্রাম। এদের মনকে পেতে হবে, এদের সঙ্গে কাজ করবার শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। সেটা সহজ নয়, খুব কঠিন কৃচ্ছ্রসাধন। আমি যদি দুটি তিনটি গ্রামকেও মুক্তি দিতে পারি অজ্ঞতা, অক্ষমতার বন্ধন থেকে, তবে সেখানেই সমগ্র ভারতের একটি ছোট আদর্শ তৈরী হবে। তোমরা কেবল ক'খানা গ্রামকে এভাবে তৈরী করে দাও। আমি

বলব এই ক'খানা গ্রামই আমার ভারতবর্ষ। তা'হলেই প্রকৃত ভারতকে পাওয়া যাবে।'[২৭]

আমার বক্তব্য এখানে শুধু একটিই। আমরা যাঁরা বাংলাদেশের সমাজ ও অর্থনীতি নিয়ে ভাবি, আমরা যাঁরা এদেশের অনুন্নয়ন ও দারিদ্র্যকে দূর করতে চাই এবং আমরা যাঁরা একটি ভবিষ্যতের সুখী বাংলাদেশ গড়ার কথা বলি, তাঁদের কর্মের ক্ষেত্র, স্বরূপ ও প্রকৃতি চিহ্নিতকরণে এর চাইতে বড় কথা আর হতে পারে না।

পাদটীকা

১. 'বারোয়ারি মঙ্গল' প্রবন্ধ, 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় মুদ্রিত, ১৩০৮ সাল।
২. ১৩৫১ সালে প্রকাশিত শ্রী প্রমথ চৌধুরীর 'রায়তের কথা' প্রবন্ধের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যে দীর্ঘ প্রবন্ধটি লেখেন, তা থেকে উদ্ধৃত, ভূমিকা অংশ, 'রায়তের কথা', প্রমথ চৌধুরী, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৪, পৃঃ ৯১।
৩. রাশিয়ার চিঠি ৭, রবীন্দ্র রচনাবলী, বিংশ খণ্ড, কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৫২ পৃঃ ৩০৪।
৪. পূর্বোল্লেখিত 'বারোয়ারি মঙ্গল' প্রবন্ধ।
৫. রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত কবিতার শিরোনাম, ক্ষণিকা, কলকাতা, ১৩০৭।
৬. এ কথাটি ইংরাজীতে 'Trade is the engine of growth' কথাটির বাংলা অনুবাদ।
৭. উপসংহার, রাশিয়ার চিঠি, রবীন্দ্র রচনাবলী পূর্বোল্লেখিত, পৃঃ ৩৩২।
৮. অ্যাডাম স্মিথের 'The Wealth of Nations' বইটির কথা বলা হচ্ছে।
৯. অম্লান দত্ত, গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট, ১৩৯৩, পৃঃ ৮৪।
১০. উপসংহার, রাশিয়ার চিঠি, পূর্বোল্লেখিত, পৃঃ ৩৩২ ও প্রমথ চৌধুরী, রায়তের কথা, পূর্বোল্লেখিত।
১১. রাশিয়ার চিঠি ৬, রবীন্দ্র রচনাবলী পূর্বোল্লেখিত, পৃঃ ২৮৫। এখানে উল্লেখ্য যে এত বছর পরও বর্তমানেও সমবায়ের কার্যক্রম বলতে আমরা ঐ কাজকেই বুঝি যার প্রতি রবীন্দ্রনাথ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।
১২. সভাপতির অভিভাষণ, পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনী, ১৩১৪।
১৩. রাশিয়ার চিঠি ২, রবীন্দ্র রচনাবলী, পূর্বোল্লেখিত, পৃঃ ২৮৫
১৪. পল্লীসেবা, শ্রীনিকেতনের উৎসবে কথিত, ১৩৩৭।
১৫. প্রাগুক্ত।
১৬. অম্লান দত্ত, পূর্বোল্লেখিত, পৃঃ ৮৫।
১৭. সমবায়নীতি, পুস্তিকা, ১৩৩৫।

১৮. অম্লান দত্ত, পূর্বোল্লেখিত, পৃঃ ৯৪।

১৯. প্রাগুক্ত।

২০. এ উক্তিটি কবির জাভাযাত্রীর পত্র, ৩ থেকে নেয়া।

২১. অম্লান দত্ত, পূর্বোল্লেখিত, পৃঃ ৯২।

২২. এ উদ্ধৃতিগুলো রাশিয়ার চিঠির বিভিন্ন অংশ থেকে নেয়া হয়েছে। রবীন্দ্র রচনাবলী, পূর্বোল্লেখিত।

২৩. রাশিয়ার চিঠি, ১৩, রবীন্দ্র রচনাবলী, পূর্বোল্লেখিত পৃঃ ৩২৮।

২৪. রাশিয়ার চিঠি, ৫, রবীন্দ্র রচনাবলী, পূর্বোল্লেখিত, পৃ: ২৯৩

২৫. শ্রীমতী প্রতিমা দেবীকে লিখিত পত্র থেকে উদ্ধৃত, ১৯৩০।

২৬. আমার এ বক্তব্যের সমর্থন মিলবে শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনা ও অভিভাষণে, রবীন্দ্র রচনাবলী, সপ্তবিংশ খণ্ড, কলকাতা বিশ্বভারতী, ১৩৫২।

২৭. শ্রীনিকেতনের ইতিহাস ও আদর্শ, শ্রীনিকেতনের কর্মীদের সভায় কথিত, ১৩৪৬।

গ্রন্থপঞ্জী

অম্লান দত্ত, গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৩৯৩।

গোলাম মুরশিদ, 'রবীন্দ্র সাহিত্যে পূর্ববঙ্গ', সীমার মাঝে অসীম, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৩৯৩, পৃঃ ১৪০-১৭৮।

প্রমথ চৌধুরী, রায়তের কথা, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৪।

বিশ্বভারতী, রবীন্দ্র রচনাবলী (সকল খণ্ড), কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৫২।